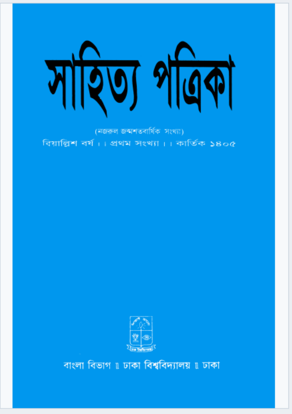

Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের কবিতা ও গানে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হারুন-অর-রশীদ
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.9
Pages	254-286
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের কবিতা ও গানে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার

হারুন-অর-রশীদ*

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 'বিদ্যাসুন্দর'-'অন্নদামঙ্গালে', উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রচুর আরবি ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালে বাংলা কাব্যে নজরুলের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদারের হাতে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এঁরা নজরুলের পূর্বসুরি। এঁদের ভূমিকা পথিকৃতের।

বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। প্রসঙ্গত সেটা স্মরণ করা জরুরি। এদেশে ইংরেজ আগমণের পূর্বে রাজভাষা ছিল ফার্সি। বিদেশাগত রাজন্য, নৃপতি, অমাত্যবর্গ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করতেন ফার্সি, শাসকগোষ্ঠীর কৃপা-আনুকূল্য ও চাকুরি-বাকুরি লাভের আশায় উপমহাদেশের মানুষ তখন রাজভাষা আরবি-ফার্সি শিখতেন। ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জনের চেষ্টা করতেন এ দু' ভাষায়। সঙ্গত কারণেই সাহিত্যে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। মুসলিম কবিদের সৃষ্ট মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যানগুলো এর প্রকৃষ্ট নজির।

কিন্তু এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৮৩৫ খ্রি. এ ফার্সির পরিবর্তে সরকারি কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফলে আরবি-ফার্সি শিক্ষিত এক বিপুল জনগোষ্ঠী চাকুরি-বাকুরি ও রাজকাজে তাঁদের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে নব্য শাসকশ্রেণীর কৃপা-আনুকূল্য লাভের আশায় অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির আমলে ইংরেজি

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, মুল্যবোধ ও যুক্তিবিচার আত্মীকরণের প্রয়াস প্রবল আকার ধারণ করে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের মতো দু'চারজন ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্চায় আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। নজরুলের পারিবারিক ঐতিহ্যেও আরবি-ফার্সি চর্চার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। নজরুল নিজেও পল্টন জীবনে এবং তারও আগে মুন্সি নুরন্নবীর নিকট ফার্সি শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। সৌভাগ্য লাভ করেন হাফিজ-রুমী-ওমর খেয়ামের কাব্য পাঠের। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের অনুশাসনে লালিত উত্তরাধিকারের সাথে আরব-পারস্যের নানান অনুষঙ্গ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় কারণেই মুসলিম সন্তানকে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হয় 'কোরআন', যার ভাষা ক্লাসিক আরবি। সেই সঙ্গে ফার্সিও। নজরুলকেও শিখতে হয়েছে। গ্রাম্য মক্তবের শিক্ষক হিসেবে শেখাতে হয়েছে ছাত্রছাত্রীকে। এসব মিলিয়েই নজরুল লাভ করেন আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের অধিকার। যে অধিকারের শিকড় সত্যেন-মোহিতলাল লালিত প্রান্তিক মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে চলে গেছে অনেক গভীরে। এঁদের চেয়ে নজরুলের হাতে আরবি ফার্সি শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যবাহী এবং বহুলাংশে সঠিক ও যথাযথ। পয়ারের শোষণ ক্ষমতার মত নজরুলের শব্দ আত্মীকরণ ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের ব্যাপক। বাংলা শব্দের পাশপাশি বিদেশি শব্দের (আরবি-ফার্সি) সুষম ব্যবহার প্রকৃত প্রস্তাবে নজরুলের হাত ধরেই। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধি এত দূর যে, তাঁর সম্পর্কে কবিগুরুর নিম্নোক্ত উক্তিটি অকম্পিত কণ্ঠে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যাস, "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফুটাতে।"

এ বিষয়ে মুগ্ধ-বিমোহিত মোহিতলাল মজুমদারের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করা যাক। নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' পাঠ করে চকিত আনন্দে বিভোর মোহিতলাল তাঁকে 'বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত' জানিয়ে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে লেখেন :

> ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবিত্ব শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ অর্থগত ভাবের সুর, কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম

হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর–অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিব—

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী এ যে তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকামাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারি গান—'লা-শরীক আল্লাহ্।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডমরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ; বিশেষত এর শেষ ছত্রের বাক্য 'লা-শরীক আল্লাহ্' – যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবি বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।[১]

নজরুলের আরবি শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য বিষয়ে মোহিতলালের উপর্যুক্ত উক্তি খণ্ডিতভাবে উর্দু এবং সমভাবে ফার্সি শব্দ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। বস্তুত নজরুল কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের সুসম ব্যবহার। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমরা প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের কিছু নমুনা চয়ন করতে পারি। প্রথমে 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'বিদ্রোহী' কবিতার "আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হরদম ভরপুর মদ"[২] –বাক্যাংশের কথা উল্লেখ করা যায়। ফার্সি 'পেয়ালা' ও 'হর্দম' শব্দের সাথে উর্দু 'হ্যায়' শব্দের সহযোগে গড়ে ওঠা উপরি-উক্ত বাক্যটি পাঠ করে বিস্মিত হবেন না এমন পাঠকের সন্ধান মেলা সম্ভবত দুষ্কর। তদুপরি আছে ফেনায়িত শরাবে ভরপুর পেয়ালার সাথে নিজেকে উপমিত করার প্রাণ উপচানো চিত্রকল্প। এ যেন 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'[৩] ; আত্মোপলব্ধির চকিত বিভাস। যিনি 'আপনারে ছাড়া' 'কাহারে কুর্নিশ করেন ন,া খোশ মেজাজ সেই ইরানি

১. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮, জুন ১৯৯১, পৃষ্ঠা–১০

২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী' "অগ্নিবীণা", *নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৭০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ৮

৩. জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র।*

শাহান শাহ-র মতই নজরুল ; বাংলা কাব্যের যুবরাজ। ফার্সি শব্দ 'কুর্নিশ' তাই এ ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রযুক্তি। আবার ভরপুর শব্দটির সাথে 'মদ' কথাটার পরিবর্তে ফার্সি 'শারাব' প্রয়োগ করলে যৌবনের উচ্ছল মদমত্ততা এবং প্রাণময় পৌরুষের মাদকতা ভাবটি অপ্রকাশিত থেকে যেত, নষ্ট হয়ে যেত কাব্যিক শব্দ মাধুর্য এবং একথাও অবশ্যই বলা যেত না যে 'অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে' যেত 'বহুদূর ভাবের স্বাধীন লোকে।[৪] অনুরূপ ভাবে 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া/ উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রী'র কথাটার সমুন্নত ভাবব্যঞ্জনা নিরতিশয় ম্লান হয়ে যেত ফার্সি 'খোদা'র পরিবর্তে আরবি 'আল্লাহ' এবং আরবি 'আরশ'-এর পরিবর্তে আকাশ কিম্বা অন্য যে কোন ভাষার যে কোন শব্দ প্রয়োগ করলে। আমাদের দাবির সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে বিকল্প শব্দ তিনটি বসিয়ে মগ্ন চৈতন্যের সঙ্গে পংক্তি দু'টি পাঠ কিম্বা আবৃত্তি করলে।

একই ব্যাপার ঘটবে কবির অকুতোভয় দুর্জয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে 'সপ্তনরক-হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া' প্রসঙ্গের অনুভাবনায়। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মননগত বিশ্বাস মৃত্যুর পর পাপীদের অনন্ত শাস্তিভোগের স্থান 'সপ্ত নরক' ও 'হাবিয়া দোজখ' ; একই সঙ্গে ব্যবহারের কৃৎকৌশল অভাবিত। দোজখের আরবি প্রতিশব্দ 'জাহান্নাম।' হাবিয়া দোজখে'র পরিবর্তে কবি যাদি লিকতেন 'হাবিয়া জাহান্নাম', তাহলে কেমন হত? তাতে কবির শব্দ প্রয়োগের নৈরাজ্য ও ব্যভিচারই প্রকট হয়ে উঠত না কি? অথচ দেশি শব্দের সাথে বিকল্পহীন বিদেশি শব্দের মিলন ঘটিয়ে কবি যখন সৃষ্টি করেন 'সপ্ত-নরক হাবিয়া দোজখে'র মত যুগল শব্দ-প্রতিমা, তখন অবাক না হয়ে পারা যায় কি? একেই কি বলে না অবশ্যম্ভাবী শব্দের সুবিন্যস্ত বিন্যাস? এ যেন সুদর্শনা-সুন্দরী বিদেশি নারীর গর্ভে জাত সুকুমার দেশি সন্তান ; যেমন সুশ্রী, সুদর্শন তেমনি সৌম্য ললিত মোহন। 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া' 'পুষ্পের হাসি' হাসা কেবল মাত্র এমন সৎ কবির পক্ষেই তো সম্ভব। এমন জাত কবির সম্পর্কেই সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের মন্তব্য, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' অন্তত তাঁর পূর্বে এবং পরেও (অদ্যাবধি) আর তো দেখা যায়নি আরবি-ফার্সি শব্দ নিয়ে এমন বহু ভঙ্গিম-বিচিত্র-সার্থক খেলা। প্রসঙ্গত ফররুখ আহমদের নাম স্মরণে আসতে পারে, কিন্তু তিনিও নজরুলের সমতালে সমান্তরলাল চলতে পেরেছেন এমন দাবি সম্ভবত কেউ করবেন না। তিনি যেমন নাচান শব্দ তাঁর হাতে তেমনি নাচে।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্বৃত দৃষ্টান্তে 'নরক' কিম্বা 'দোজখ', 'জাহান্নামে'র স্থলাভিষিক্ত হলে কেমন বেসুরো লাগত, দেখুন :

১. আমি নরকের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

২. আমি দোজকের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

'ধূমকেতু' কবিতার ৩য় পংক্তিতে উক্ত "সাত-সাত শ'ও নরক জ্বালা জ্বলে মম ললাটে" কাব্যাংশের 'নরক' শব্দটি তুলে দিয়ে আরবি প্রতিশব্দ 'জাহান্নাম' ব্যবহার করা যেত কি? কিম্বা ঐ একই কবিতার "পেলে বাহান্ন শও জাহান্নামেও আধা চমুক সে শুষে খাই" –এর পরিবর্তে বিকল্প শব্দ হিসেবে নরক প্রয়োগ করলে কেমন হত? পক্ষান্তরে উপর্যুক্ত দুই পংক্তির 'নরক' ও 'জাহান্নাম' শব্দ দুটি সুসম শব্দ বিন্যাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয় কি? এবং সেই সূত্রে আরবি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুলের নৈতিক শুদ্ধাচারিতা ও দক্ষতাই প্রমাণিত হয় নাকি?

'অগ্নিবীণা' কাব্যের মুসলিম প্রসঙ্গমূলক কবিতা সাতটি, 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মোহররম'। এগুলিতে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ অনেকাংশেই যুক্তিসিদ্ধ, মৌলিক ও অভাবিতপূর্ব। কোন একটি বিশেষ ভাষার শব্দরাজিকে অন্য ভাষায় প্রয়োগ করতে হলে ভাষা বিষয়ে প্রাজ্ঞতা ও ব্যবহারিক নৈপুণ্য প্রয়োজন, নজরুলের তা অনেকটাই ছিল। এ বিষয়ে তাঁর 'কাব্য আমপারা', 'রুবাইয়াৎ ই-ওমর খৈয়াম', 'রুবাইয়াৎ ই-হাফিজ' প্রভৃতি অনুবাদের কথা স্মরণ করা যায়। কাব্য আমপারা প্রথম প্রকাশ করেন করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশের আগে, কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার প্রধান প্রধান মোদাররেস এবং ইসলামিয়া কলেজের আরবি, ফার্সি ও উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের একত্রে সমাবেশ করে অনুবাদের শুদ্ধতা যাচাই করে নেন প্রকাশক মওলানা আবদুর রহমান খান।[৫] বলাবাহুল্য তাতে টুকিটাকি সামান্য সংশোধন ছাড়া নজরুলের অনুবাদ ত্রুটিমুক্ত প্রমাণিত হয়। প্রসঙ্গত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদ সাফল্য সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্যও স্মর্তব্য : "কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।"[৬]

---

৫. মাহফুজুর রহমান, 'স্মৃতিচারণ', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ,* ১৩৮০ সংখ্যা

৬. সৈয়দ মুজতবা আলী, নজরুল অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-এর ভূমিকা, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০,

তাঁর দেওয়ানে হাফিজ অনুবাদের উৎকৃষ্টতাও সুধীমহলে স্বীকৃত। এসব তথ্য থেকেও আরবি ফার্সি ভাষা বিষয়ে নজরুলের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। বাংলা ভাষা তো তাঁর মাতৃভাষাই ; জন্ম মাত্রেই এর সাথে তাঁর নাড়ির যোগ। ফলে আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে তাঁর অধিকার ও সাফল্য অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য।

মুসলিম অনুষঙ্গ চিত্রায়ণে আরবি-ফার্সি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা ব্যবহারের উপযোগিতাও স্বীকার্য। স্বীকার্য এ কারণে যে তাতে মুসলিম পাঠকের বোধ ও বোধীকে তীব্রভাবে স্পর্শ করা সম্ভব। সম্ভব এজন্যে যে সে বিষয়ে তাদের একটি পূর্ব মৌল ধারণা থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে ভিন্নধর্মাবলম্বী পাঠকদের পক্ষে কবির ব্যবহৃত শব্দ, অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মিথলজি, ঐতিহ্যসাকিতা, দর্শন ও শিক্ষার তাৎপর্য খানিকটা হলেও অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে শক্তিধর কবি -প্রতিভা যদি বিষয়টা প্রাঞ্জল, বোধগম্য ও সর্বজনগ্রাহ্য করে প্রকাশ করতে পারেন। এই শেষোক্ত গুণটিও নজরুলের কবি-চরিত্রে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বরং বলা চলে নজরুলের মৌল কবি-প্রতিভার স্পর্শে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ আমাদের ভাষা সাহিত্যে একটি বৈচিত্র্যময় দিগন্ত উন্মোচন করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ভাব প্রকাশের উপযোগিতা। দাবির স্বপক্ষে 'কামাল পাশা' থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লিখিত হচ্ছে :

১. মার দিয়া ভাই মার দিয়া
দুশাসন সব হার গিয়া
কিল্লা ফতে হো গিয়া।[৭]

২. আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোস টুটেছে
ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে।

৩. আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,
ফুল মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ।

৪. আব জম্‌জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সি বিষের !

পৃ. ১০২৪

৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নিবীণা", *নজরুল রচনাবলী* ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ২৩

কে মরেছে? কান্না কিসের?

বেশ করেছে!

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে!

বেশ করেছে।

উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তে ফার্সি শব্দ 'দুশমন'-এর সাথে উর্দু শব্দ 'মার দিয়া', 'হার গিয়া' ব্যবহার করে জয়োল্লাস ব্যক্ত করেছেন কবি 'কিল্লাহ ফতে হোগিয়া' বলে। কিন্তু তাতে অসম শব্দ বিন্যাসের পীড়া পাঠকের শ্রুতিকে কখনই পীড়িত করে না। শ্রুতি মাধুর্যও হয় না এতটুকু বিঘ্নিত। আবার আরবি শব্দ 'কিল্লাহ্' ও 'ফতে' উর্দু 'হোগিয়া'র সাথে প্রযুক্ত হয়ে কী চমৎকার 'এক দেহে হল লীন'! এসব ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগের প্রশ্ন তোলা কঠিন। যেমন কঠিন দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আত্মোল্লাস ব্যক্ত প্রয়াসে 'খুন ছুটেছে হোস টুটেছে'-র মত কুশলী শব্দবিন্যাস দৃষ্টে আপ্লুত না হওয়া। কেন না খুশিতে ডগমগ হওয়া কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই যেমন বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টিতে লালাভ নাসাগ্র এবং রক্তাভ চিবুকের ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি 'ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে' শোনা মাত্র উদ্বেলিত পৌরুষের ছবি চিত্রময়তা লাভ করে এবং সৃষ্টি হয় একটি সফল রূপকল্প।

আবার তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'কূল মুলুকের কুষ্টি' করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ'-এর অনিবার্য প্রায়শ্চিত্ত তুর্কিনাচন'। 'নাচলে তাধিন তাধিন শেষ' তাই শ্রুতির পালে নতুন হাওয়া যোগায় এবং 'কূল মুলুক' কথাটার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে চতুর্থ দৃষ্টান্তে অকুতোভয় তুর্কিসেনানীদের আত্মত্যাগকে উপমিত করা হয়েছে পবিত্র 'আব্ জমজমের' সাথে। মুসলিম পাঠকমাত্রই 'আব্ জম্‌জম' পরিভাষাটির তাৎপর্য অনুধাবন করে আপ্লুত হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? প্রসঙ্গেত একথা বলা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ব্যবহার গুণে শব্দটি স্বর্গীয় দ্যোতনা লাভ করেছে। মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে বঙ্গ ললনার সাথে বেদুঈন বালা।

"আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলোয়ার হানো আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!"[৮]

---

৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আনোয়ার' (অগ্নিবীণা), *নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড*, পৃ. ২৮

আনোয়ার কবিতার এই অংশটি পাঠ করে কোন পাঠকেরই কি মনে হবে কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং শব্দগত মাধুর্য 'আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করে নষ্ট করে ফেলেছেন কবি কিম্বা সৌন্দর্য হানি ঘটিয়েছেন শ্রীমতি কাব্যদেবীর? কখনই নয়। বরং ললিত কথাগুচ্ছের মাধুর্য পাঠকের কানে কানে মধুবর্ষণ করে ক্রমাগত। সেই সঙ্গে "আনোয়ার, আফ্‌সোস!/ বখতেরই সাফ্‌দোষ/রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপজোশ্, /ভেঙে গেছে শমসের - পড়ে আছে খাপ কোষ / আনোয়ার আফ্‌সোস,' —প্রভৃতি পংক্তিতে ব্যবহৃত 'আফ্‌সোস', 'বখ্‌ত', 'সাফ্', 'খিঞ্জির', 'গর্দান', 'জোরওয়ার 'হুঁশ তিল', 'মুশকিল', 'পস্তানো', লোহু ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যথার্থ।

একই কথা বলা যায় 'রণ-ভেরী' কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় সম্পর্কে

১. বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাথিয়ার পাঞ্জায়,

২. খুন-জোশী বীর, কুঞ্জলি লেখা আমাদের খুনে নাই।[৯]

'শাত-ইল-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' প্রভৃতি সম্পর্কেও অভিন্ন মন্তব্য অবশ্যম্ভাবী। "শাফায়াত পাল বাঁধা তরণীর মাস্তুল,/ জান্নাত হতে ফেলে হুরী রাশ রাশ ফুল"[১০] কিম্বা "আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,/ আজাদী মেলে না পস্তানোয়,/দস্তা নয় সস্তা নয়।"[১১] অথবা "নীল সীয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়ায়,/ আম্মা। লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া," "শির দেগা, নাহি দেগা আমামা"-[১২] -ইত্যাকার বর্ণনায় আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের সুসামঞ্জস্য কাব্য-কলায় ভাব প্রকাশে বহুমুখী বিস্তার ঘটিয়েছে। অসাধ্য সাধনে কবি লাভ করেছেন পরম সিদ্ধি, চরম সাফল্য।

নজরুলের হাতে 'আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের প্রযুক্তিগত দক্ষতা 'বিষের বাঁশী' (১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১) কাব্যগ্রন্থেও সমভাবে বিস্তারশীল। তবে বিষয়ে-মননে মাঝখানের কাব্য 'দোলন চাপা' (আশ্বিন, ১৩৩০) ব্যতিক্রমী চারিত্রের। দোলন চাঁপায় -'আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। এতদসত্ত্বেও এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'আজ-সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' র "মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর 'টগবগিয়ে খুন

---

৯. 'রণভেরী' (অগ্নিবীণা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১০. *প্রাগুক্ত*, 'খেয়াপারের তরণী', (অগ্নিবীণা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১১. *প্রাগুক্ত*, 'কোরবানী', "অগ্নিবীণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১২ *প্রাগুক্ত*, 'মোহররম', "অগ্নিবীণা", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

হাসে" এবং "কারুর পায়ে বুকডলা খুন, কেউবা আগুন,/ কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে"[১৩] প্রভৃতি পংক্তির টগবগিয়ে খুন হাসে' ও 'বুকডলা খুন' শব্দগুচ্ছে জোয়ানি খুনের টগবগানিভাব যথার্থ রূপকল্পে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও ফার্সি 'খুন' শব্দের বিকল্পে অন্যকোন ভাষার সমার্থক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। তারুণ্যের উদ্দীপনা আর যৌবনের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার যখন সত্যিকার অর্থেই 'টগবগিয়ে' ওঠে তখন 'খুন' নিয়ে খুনাখুনি করতে কেইবা ভয় পায়! আবার সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে জাত নবীন কোন প্রেমানুভূতিকে যখন কোন সুন্দরী তরুণী তন্বী সদম্ভ পদচারণায় মাড়িয়ে যায়, হেলায় উপেক্ষা করে, তখনকার ভগ্নহৃদয় দয়িত-প্রেমিকের হতাশ্বাসকে 'বুকডলা খুন' ছাড়া অন্য কোন বিকল্প বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি আভাসিত করা যায়, বলা কঠিন। অতএব 'দোলন চাঁপায়' আরবি-ফার্সি শব্দের বহুল ব্যবহার না থাকলেও, দক্ষ ব্যবহারের নমুনা দুর্লভ নয়। অনুরূপভাবে 'বিষের বাঁশীতে' একই বিষয়ে সুলভ দৃষ্টান্তের বেশ কিছু নমুনা [১৪] উল্লেখ করা যায় :

১. তসলিম হর কুর্ণিশে শোর আওয়াজ-

২. চলে আঞ্জাম

দোলে তাঞ্জাম

খোলে হুর পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম!

টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর হাতে 'আব্ জমজম জাম্"

৩. দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান,

৪. সাবে ঈন

তাবে ঈন

হয়ে চিল্লায় জোর 'ওই ওই নাবে দীন!

ভয়ে ভূমি চুমে লাত মানাত-এর ওয়ারেশীণ।

৫. পানি কওসর

মণি জওহর

১৩. 'সৃষ্টি-সুখের-উল্লাসে', 'দোলন চাঁপা", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৪. 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম, (আবির্ভাব), (বিষের বাঁশী), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৫

আনি 'জিব্‌রাইল আজ হরদম দানে গওহর,

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' (আবির্ভাব) শীর্ষক কবিতা হতে গৃহীত। হজরত মুহম্মদের জন্ম উপলক্ষে পরিপার্শ্ব চিত্রায়ণে নজরুলের অনুভূত ও পূর্বপুরুষগত বিশ্বাসের উত্তরাধিকার প্রকাশিত হয়েছে দৃষ্টান্তগুলিতে। তসলিম, আঞ্জাম, ফেরদৌস, হাম্মাম, কওসর, আব্‌জমজম, মশগুল, শিস্তান, বোস্তান প্রভৃতি শব্দ মুহম্মদের আবির্ভাব লগ্নের রূপকল্প সৃষ্টিতে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত। এগুলি যে মুসলিম মননের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ একথাও অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তাওহিদবাদী বিশ্বাসকে অত্যুজ্জ্বল করে তোলার ক্ষেত্রে সাবেঈন, তাবেঈনদের সম্মিলিত সোচ্চার স্বীকারোক্তি এবং কাবাগৃহে রক্ষিত লাত, মা-নাত প্রভৃতি মূর্তির আনত প্রণতি মুহম্মদের মহাপুরুষত্বের অনিবার্যতাকেই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছে। এবং এসব কারণেই নজরুলের শব্দ প্রয়োগগত সাফল্য নন্দিত হবার যোগ্য। অন্তত "পানি কওসর / মণি জওহর/আনি জিব্‌রাইল আজ হরদম দানে গওহর" বাক্যাংশের তাৎপর্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষের নিকট মুহম্মদের অলৌকিকত্বের যেমন প্রমাণ হয়ে ওঠে তেমনি আরবি 'কওসর' ও 'জওহর' শব্দের সাথে যথাক্রমে পানি-মণির সংযুক্তি একাধারে তাঁর শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব প্রদর্শন করে এবং অন্যদিকে নতুন শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

কিংবা নজরুল যখন বলেন, "আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া"[১৫] – তখনও কি ফার্সি শব্দ 'তেগ'-এর সুসম ব্যবহারে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়! অথবা "আমি বলি নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বাল-কুণ্ড সূর্যের হাম্মামে"[১৬] এর 'নার' এবং 'হাম্মাম' যখন একীভূত হয়ে যায় বাংলা শব্দের সাথে, তখন? বস্তুত এসব ক্ষেত্রে নজরুলের পারঙ্গমতা অস্বীকার করা কঠিন। যেমন কঠিন 'পড়ছে কেতাব, নিচ্ছে খেতাব, নিমকহারাম, বেঈমান"[১৭] — এই ছোট্ট বাক্যের 'কেতাব', 'খেতাব', 'নিমকহারাম', 'বেঈমান' শব্দ চতুষ্টয়ের সুসম বিন্যাসের কথা অস্বীকার করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উল্লিখিত বাক্যে দুটি মাত্র বাংলা ক্রিয়াপদ ছাড়া আর সব কটা শব্দই আরবি-ফার্সি শব্দ। কিন্তু নজরুল এ ক্ষেত্রে এতটাই সফল

---

১৫ . ফাতেহা-ই-দেয়াজ দহম (তিরোভাব), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

১৬. ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

১৭. মিলন-গান, "ভাঙার গান", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

প্রয়োগের অধিকারী যে, পাঠক কিম্বা শ্রোতার কস্মিন কালেও মনে হবে না ওটা বাংলা ভাষায় কোন বাক্য নয়।

মূলত নজরুলের আত্মীকৃত আরবি-ফার্সি শব্দ দেশীয় ভাষা, ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান রীতি-নীতি, বিশ্বাস এবং প্রাত্যহিকতার সাথে সাঙ্গীভূত ; যাকে বলে 'জীবনের সাথে জীবনের যোগ'। ফলে কি 'শহীদি ঈদ', কি 'পাপ' কি 'আমার কৈফিয়ত' প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক কবিতার ক্ষেত্রেই নজরুলকে আমরা পাই শব্দ সচেতন প্রয়োগ নিপুণ শিল্পী হিসেবে। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে আরো কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন লোহিত তাজ,
আল্লার রাহে চাহেসে ভিখ্ ;
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লাহর রাহে তাহারে দে
চাহিনা ফাঁকির মণি-মানিক"।[১৮]

২ "জবীহুল্লাহ" ছেলেরা হোক
যাক সব কিছু—সত্যরোক।"[১৯]

৩. অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙ্গুরী খুনে তিতি।"[২০]

৪. ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজীও,
যদিও শহীদ হইতে রাজিও !
আমপারা পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে।
হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাতনেড়ে।[২১]

প্রথম দৃষ্টান্তের 'শিরোপরি খুন লোহিত তাজ' কিম্বা 'জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে'

---

১৮. শহীদি ঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
১৯ . ঐ, পৃ. ৫৭
২০. 'পাপ', "সামাব্যদী", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮
২১. 'আমার কৈফিয়ত' "সর্বহারা", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩

বাক্যাংশ পাঠ করে অপরিচয়ের বেদনায় পাঠক আহত হবেন বলে মনে হয় না, তা সে মুসলিম অথবা অমুসলিম যে পাঠকই হোন না কেন। 'খুন' আরবি শব্দ, অর্থ রক্ত। অন্যদিকে 'তাজ' ফার্সি শব্দ, অর্থ মুকুট। মাঝখানের 'লোহিত' শব্দটি সংস্কৃত রুহ্ + ইত[২২]-যোগে গঠিত, যার অর্থ লাল বা রক্তবর্ণ। দুটি ভিন্ন ভাষার একার্থবোধক সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করে বিশেষিত করেছেন 'তাজ' শব্দটিকে। রক্তাক্ত তাজ বা লাল মুকুট শোভিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে ঈদুল আজ্হার প্রত্যাশা 'আপনার চেয়ে আপন যে জন' 'আল্লাহ্র রাহে তাহারে দে'। কিন্তু আত্মত্যাগের সে তাৎপর্য উৎসবের বিকৃত আনন্দে পর্যবসিত আজ। নজরুলের বেদনা এখানেই এবং এ কারণেই বাক্যের পরবর্তী বিস্তার 'চাহিনা ফাঁকির মণি-মানিক'। সুতরাং ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের চয়িত শব্দত্রয় যে সুসম, যথোপযুক্ত এবং যথেষ্ট কার্যকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিম্বা একথাও বলা যায় না যে, মাঝখানের 'লোহিত' শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোন সম্পূরক শব্দ প্রয়োগ করা চলত। কি শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন কবি? লাল, রক্তাক্ত? লালাভ? কেমন শোনাতো তাহলে শুনুন :

ক. শিরোপরি খুন লাল তাজ।

খ. শিরোপরি খুন রক্তাক্ত তাজ।

গ. শিরোপরি খুন লালাভ তাজ।

একমাত্র 'লালাভ' শব্দের সাহায্যে কাব্যাংশের শ্রুতিমাধুর্য ও ধ্বনিগত ওজস্বিতা অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ঈপ্সিত অর্থ বা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় না। কেননা 'লালাভ' শব্দের অর্থ লাল আভাযুক্ত, পূর্ণাঙ্গ লাল বর্ণ নয়। রক্তাক্ত অর্থেও তা কখনই ব্যবহৃত হতে পারে না। ইত্যাকার বিচারের আরবি 'খুন' এবং ফার্সি 'তাজ' শব্দদ্বয়ের মাঝখানে 'লোহিত'-এর পরিবর্তে অন্যকোন শব্দ ব্যবহার করলে তা অবশ্যই হত অপ্রপ্রয়োগ এবং তাতে করে আরবি-ফার্সি শব্দ দুটোরই জাত্যাভিমান চ্যুতি ঘটত বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'জবীহুল্লাহ' শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা। 'জাবেহ' এবং 'আল্লাহ' শব্দ দুটির সহযোগে গঠিত সন্ধিজাত শব্দটি আল্লাহর পথে নিঃশর্ত আত্ম সমর্পণের ব্যঞ্জনাকে তুলনারহিত করে তুলেছে। তবে অমুসলিম পাঠকের পক্ষে

২২. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত, ৩য় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৭৬৯

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গমের ক্ষেত্রে কিঞ্চিত কষ্টকর বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু নজরুলের কাব্যচর্চার সাথে যাঁদের পূর্বাপর পরিচয় গড়ে উঠেছে, তাঁদের বেলায় বাধাটা এমন কিছু দুর্লঙ্ঘ্য হবার কথা নয়। বরং নতুন শব্দ আবিষ্কারের আনন্দই পেতে পারেন তাঁরা।

'সাম্যবাদী' কাব্যের 'পাপ' কবিতা থেকে উদ্ধৃত তৃতীয় দৃষ্টান্তের অনুষঙ্গটি তো আরো চমৎকার কাব্য ব্যঞ্জনায় প্রোজ্জ্বল। অপাপবিদ্ধ বলে অহংকারী ফেরেশতাদ্বয় হারুত–মারুত কোন প্রলোভনে কোন অবস্থাতেই পাপ করবে না বলে আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে পৃথিবীতে আসে এবং দু'দিন যেতে না যেতেই তাদের সাথে দেখা হয়ে যায় জোহরা নাম্নী এক অপরূপা তরুণী তন্বীর—যার গা ভরা যৌবন আর দেহ ভরা রূপের পসরা। এক কথায় সৌন্দর্য মথিত অনুকূল পরিপার্শ্বে শোভিত সেই রকম একজন যুবতী জোহ্‌রা, যাদের ফাঁদপাতা ভূবন সম্পর্কে খোদাতায়ালা পূর্বাহ্নেই ফেরেশতামণ্ডলীকে অবহিত করে রেখেছিলেন এবং যার 'চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার।'

"ঘাঘরি ঝলকি গাগরী ছলকি" নাগরী 'জোহরা' তখন জলকে যাচ্ছিল সহাস্যবদনে, আনন্দিত চিত্তে। তার "শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।" হারুত–মারুতের ফলে "স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে বিকাইয়া রাঙা পায়।"

এই চিত্রকল্পটি বর্ণনার প্রয়োজনেই নজরুলের প্রাগুক্ত তৃতীয় উদ্ধৃতিটির শরীর সংগঠন। মেয়েটির হালকা পাতলা লালাভ ঠোঁটের মাধুর্যে বিমোহিত ফেরেশতাদ্বয় ভুলে গেল দোজখের প্রজ্জ্বলন্ত হুতাশনে অনন্তকাল দগ্ধীভূত হওয়ার ভয়ঙ্কর ভীতির কথা, খোদাতায়ালার হুশিয়ারির কথা। নজরুলের বর্ণনায় বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে, "অধর–আনার–রসে ডুবে গেল দোজখের নার ভীতি।" এখানে ফার্সি 'আনার' শব্দের সঙ্গে উপমিত করেছেন কবি জোহরার ঠোঁট এবং তা থেকে নিঃসৃত রসকে অভিহিত করেছেন 'আনার রস' বলে।

অনুধাবনের সুবিধার্থে প্রসঙ্গটির একটুখানি ব্যাখ্যা করা যায়। ফার্সিতে 'আনার' বলতে যা বুঝায়, বাংলায় সেটা হচ্ছে ডালিম ফল। রসজ্ঞ ভোক্তামাত্রেই অবগত আছেন সুপক্ক ডালিমের দানা চিবুলে এক ধরণের মিষ্টি রসের আস্বাদন পাওয়া যায়, যা রসনা ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যেই উপাদেয়। জোহরার ঠোঁটে সেই রকমই পরিপক্ক আনার রসের অমৃতময় আস্বাদনের সন্ধান পেয়েছে হারুত–মারুত এবং পরিণামে ভুলে গেছে 'নার ভীতি'। অর্থাৎ তন্বী জোহরার ঠোঁটামৃত পানের অফুরন্ত আনন্দের

কাছে হারুত-মারুতের অনুভবে দোজখের শাস্তি এমন কিছু ভয়ঙ্কর বিষয় নয়। একেই কি বলে না 'সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়েছে হারুত-মারুত। শিশির রূপ দোজখ শাস্তিতে তাদের আর ভয় কিসের!

এক্ষেত্রেও মননশীল চিন্তায় দেখা যাবে, বর্ণনায় চিত্ররূপময়তা, রসময়তা, অনুধ্যেয় বিষয়ে ব্যাপ্তি সাধন, ভাবে গভীরতা আনয়ন এবং সঠিক তাৎপর্য সৃষ্টিতে 'আনার' এবং 'নার' শব্দদ্বয় সুনিপুণ বিন্যাসে বাঙ্ময় ; বিকল্পহীন সার্থক প্রয়োগে সিদ্ধ, কেমন সিদ্ধ চতুর্থ দৃষ্টান্তের 'ফতোয়া', 'কাফের', 'শহীদ', 'আমপারা', 'হামবড়া', প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার।

সব কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেই যে নজরুল ব্যাপক আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন এমন নয়। 'দোলন চাঁপা' কাব্যের মত স্বল্পতম আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার অনেক কাব্যেই দৃষ্ট। নজরুল মূলত বিষয় অনুষঙ্গী শব্দ ব্যবহারে সচেতন ছিলেন। কবিতায় প্রাসঙ্গিক আবহ সৃষ্টি ও যৌক্তিক চিত্রকল্প শব্দকুশলী নজরুলের এটাই হচ্ছে মূল চারিত্র। শব্দ যাঁরা বাজাতে জানেন, তাঁদের হাতে শব্দ সত্যি কথা কয়ে ওঠে ; ভাবের বদ্ধ অর্গল খুলে বেরিয়ে আসে শফরি কথকতা। কাব্যকলার এমনি অচিন্তনীয় কুশলী শিল্পীদের মধ্যে নজরুলের স্থান আভিজাতিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ফণি-মনসা' (১৩৩৪, শ্রাবণ) কাব্যের 'দিল-দরদী' কবিতা থেকে গোটা তিনেক উদ্ধৃতি নিম্নে চয়ন করা যাচ্ছে :

১. সিস্তানের ঐ গুল-বাগিচা
　　　গুলিস্তান আর বোস্তানে
দোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া
কাঁদল সে আফসোস্ তানে।

২ অনেক শারাব খারাব হল,
　　　অনেক সাকির ভাঙল বুক।
আজ এলো কোন্ দীপান্বিতা?
　　　কার্ শরমে রাঙ্‌লো মুখ?

৩. যিগর্ ছেঁড়া দিগর তোমার

আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে?[২৩]

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলোর শব্দ প্রয়োগ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে সিস্তান, বোস্তান, গুলিস্তান প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক অর্থ দ্যোতকতা দুর্বোধ্যতার প্রান্তসীমাও স্পর্শ করে না। বরং খাঁচার পাখির বন্দী জীবনের দুঃখ কবির বর্ণনা গুণে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয় যথার্থ সহমর্মিতার সঙ্গে। ছল ছলিয়ে ওঠে চোখ। বুকের গভীর থেকে উঠে আসে কান্না জড়িত এক প্রকার আবেগ। কবির সাথে পাঠকেরও আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে,

বেদ্‌না-ব্যথা নিত্য সাথী
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর।[২৪]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'শারাব', 'সাকি', 'শরম' শব্দত্রয়ের প্রয়োগ নৈপুণ্য ও রসও পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়। দৃষ্টি এড়াবার নয় 'যিগর ছেঁড়া দিগর তোমার / আজ কি এল ঘর ফিরে'?—কথাটার ওজস্বিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে 'যিগর', 'দিগর'-এর মত অপরিচিত শব্দের সাহসী সফল প্রয়োগ। আবার 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৬) কাব্যের উৎসর্গ পত্রে নজরুল যখন লেখেন :

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আন গুলশানে গুল, নাহার আন আলো[২৫]

তখনও বাংলা কাব্যে 'বাহার', 'নাহার', 'গুলশান', 'গুল' প্রভৃতি পারসিক শব্দের সাবলীল প্রযুক্তি দেখে বিস্ময়ের ঘোর কাটে না সহজে। একই ব্যাপার ঘটে 'বুলবুল' (আশ্বিন, ১৩৩৫)-এর গানে ব্যক্ত "আর সহেনা দিল্ নিয়ে এই /দিল-দরদীর

২৩. "দিন-দরদী", "ফণি-মনসায়", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০
২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩
২৫. উৎসর্গ কবিতা, "সিন্ধু-হিন্দোল", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯

দিল্লগী,/তাই চালাই নীল পেয়ালায় লাল-শিরাজী-বে-হিসাব”[২৬] —কথাগুচ্ছের দ-বর্ণের চমৎকার অনুপ্রাস দেখে এবং বাংলা ক্রিয়াপদের সংগে সাত সাতটি ফার্সি শব্দ ব্যবহারের কৃৎকৌশল অবলোকন করে। ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও গানটির দুরাগত বিদেশি ভাষা কঠিন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। অনুরূপভাবে ‘জিঞ্জির’ (১৩৩৫) কাব্যের মুখবন্ধ কবিতা ‘বার্ষিক-সওগাত’-এর নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি,

নৈশাপুরের গুলবদনীর চিবুক গালের টোল

রাঙ্গা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন শিরীন বোল।[২৭]

বাঙালি পাঠকের রসাস্বাদনে প্রতিকূল কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। শুধু তাই নয় একই কাব্যের ‘খালেদ’ কবিতায় কবি যখন বলেন

“উৎপীড়িতের লোনা আঁশুজলে গলে গেল কত কাবা,

কত উজ তাতে ডুবে মল হায় কত নূহ্ হল তাবা”—[২৮]

তখনও হিন্দু-মুসলিম আপামর পাঠকের কাছে তা দুর্বোধ্য ঠেকে না। বুঝতে অসুবিধা হয়না কবি সৃষ্ট চিত্রকল্পে পরিবেশিত ব্যক্তিবর্গের করুণতম শেষ পরিণতির কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে পুরো একটি আরবি Sentence কাজে লাগিয়ে একই কবিতায় নজরুল গড়ে তোলেন চমৎকার একটি বাংলা বাক্য—

খালেদ! খালেদ! ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম্,

ঐ শোন শোন! আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নৌম।[২৯]

প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তের আরবি বাক্যটির পরিবর্তে অন্য কোন সম্পূরক শব্দরাজি দ্বারা গঠিত বাক্যের সাহায্যে উদ্দীষ্ট ভাবার্থ প্রকাশ করা যেত কিনা সন্দেহ। মুসলমান সম্প্রদায়ের মজহাবী কোন্দলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নজরুল আর একটি সফল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সেটি হচ্ছে,

হান্ফী-ওহাবী-লা মজহাবীর তখনো মেটেনি গোল,

---

২৬. গান নং, ৮, “বুলবুল” প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

২৭. ‘বার্ষিক-সগাত’, “জিঞ্জির”, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৯

২৮. ‘খালেদ’, “জিঞ্জির”, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬

২৯. ‘খালেদ’, “জিঞ্জির”, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৭

এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল 'তলপী তোল।'[৩০]

আত্মকলহে লিপ্ত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, পৌরুষহীন, নিয়তিবাদী মুসলমানরূপ বৃক্ষের নিকট, নজরুলের সমকালে এবং এখনও ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিরাশার বালুচরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার মত ভয়ঙ্কর বিষয়। এ সম্পর্কে নজরুলের অনুভব নিরতিশয় হতাশাব্যঞ্জক। তাঁর ভাষায়—"রীশ-ই-বুলন্ধ, শেরওয়ানী, চোগা, তসবি ও টুপি ছাড়া/পড়ে নাক কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া।[৩১]

উদ্ধৃতির মর্মার্থ যাই হোক, একথা ভুলে যাইনি যে, আমরা নজরুলের শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে কথা বলছি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এসব ক্ষেত্রেও নজরুলের আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ অযথার্থ নয়। "দুজনার হবে বুলন্দ্-নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব?/ এ নহে বিধান ইসলামের"[৩২] – নজরুলের এ উক্তির 'বুলন্দ', 'নসিব' প্রভৃতি শব্দও নয় অবোধগম্য বা দুর্বোধ্য?

শুধু 'খালেদ' কবিতার কথাই বা বলি কেন, 'জিঞ্জির' কাব্যের 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক'-ইত্যাদি কবিতায় প্রয়োগকৃত—আরবি-ফার্সি শব্দও বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, ভাব প্রকাশের বাহনকে দিয়েছে বাড়িয়ে ; এনেছে বৈচিত্র্যতর আস্বাদন, খুলে দিয়েছে নতুনের জানালা। গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত দেই :

১. খোশ আমদেদ্ আফগান শের! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম হিন্দু শরমে নোয়ায়ে শির-বেতাজ!
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহানশাহ্!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতলগাহ!!

২. সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক্ –সুবাস, অধরে মদ,
গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনারকলির পিয়ে শাহ্‌দ।[৩৩]

৩. 'আশ হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলি

---

৩০. 'খালেদ', "জিঞ্জির", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯
৩১. 'খালেদ', "জিঞ্জির", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯
৩২. 'ঈদমোবারক', 'খালেদ', "জিঞ্জির", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬
৩৩. 'আমানুল্লাহ' 'খালেদ', "জিঞ্জির", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৫

কহিল ফাতেমা, "এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি'
নেমেছে ভুবনে মুহম্মদের অমর কণ্ঠে ভাই!
এই ইসলাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই।"[৩৪]

উপর্যুক্ত প্রথম দৃষ্টান্তের 'খোশ আমদেদ আফগান শের'-এর অর্থবাচকতা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি 'বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া' বাক্যাংশের 'বান্দা' এ 'বন্দেগী' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্যগত অর্থদ্যোতকতা এবং 'শাহানশাহ্' শব্দের সাথে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করে 'কতল গাহ', শব্দের ব্যবহার সত্যি বিস্ময়কর শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য এবং শব্দপ্রেমিকতার নমুনা। প্রকৃত শব্দরসিক কবি-প্রতিভার পক্ষেই কেবলমাত্র এমন আশ্চর্য সুপ্রয়োগ সম্ভব। খোশ, আমদেদ, আফগান, শের কোনটাই বাংলা শব্দ নয়, অথচ এদের একত ব্যবহারে যে অর্থ আভাসিত, পাঠকমাত্রেই তা যথার্থস্বরূপে অনুধাবনে সক্ষম। অথচ 'বান্দার' সাথে 'বন্দেগী'র যে আনুশাসনিক অন্বয় অবশ্যম্ভাবী, তা না থাকার ফলে যে পৃথিবীকে দেয় এদের কিছু নেই, সে কথাই শাহানশাহ আমানুল্লাকে স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন কবি এবং সেই সংগে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ভারতবর্ষ এখন আর মানুষের ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ এখন 'পশুর কতলগাহ'—মনুষ্যত্বহীন কষাইখানা। স্বাধীনতা নেই সেখানে, নেই কোন মানুষের মানবীয় মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান। ফলে উন্নত শির স্বাধীনচেতা মানুষের অনাবিল জীবনভাষ্যের সুবাসিত মলয়মারুতও প্রবাহিত হতে দেখা যায় না আকাশে বাতাসে।

অন্যদিকে অকুতোভয় মনুষ্যত্বের প্রতীক আমানুল্লাহর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে 'যুবা আফগান, চলেছে ছুটিয়া দিশাহারা' হয়ে 'করিতে দ্বিগ্বিজয়'। ফল যা হবার তাই হল, 'সারা বিশ্বের হৃদয়ময়' ছড়িয়ে গেল আমানুল্লাহর খ্যাতি, যশ এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন আফগানদের হৃদয়ের পবিত্র গীতধ্বনি। বিশেষ করে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে স্বাধীন আফগানিস্তানের আকাশে বাতাসে আফগান তরুণীদের 'মেশক্-সুবাস' মিশ্রিত শ্বাস প্রশ্বাসের সুঘ্রাণ ভেসে বেড়ায় ; লালাভ 'অধরে মদ' আকৃষ্ট করে প্রিয়জনকে এবং 'গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনার-কলির পিয়ে শাহ্দ'। এবং এ সবই হয় পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আফগানিস্তান মুক্ত বলে। চিত্রকল্পে বর্ণিত মর্যাদা পেতে হলে ভারতবর্ষকেও হতে হবে স্বাধীন—ভাঙতে হবে পরাধীনতার শৃঙ্খল, অর্জন করতে হবে অনমনীয় মুক্ত ব্যক্তিত্ব—এই হল পংক্তি কয়টির আভাসোক্ত কবি-

৩৪. 'উমর ফারুক', 'খালেদ', "জিঞ্জির", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৮

আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের ফলে কথিত ভাবার্থ দুর্জ্ঞেয় হয়ে পড়েছে একথা কি বলা যাবে জোর করে? মনে তো হয় না।

অনুরূপভাবে তৃতীয় দৃষ্টান্তে স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করতে আরবি ভাষার উপর-উক্ত বাক্যটিকে নজরুল যখন অক্ষতভাবে ব্যবহার করেন, তখনও কি দুর্বোধ্য বলে মনে হয় ওটিকে?

বাংলা মার্চ সংগীতের ইতিহাসে নজরুলের অবদান অগ্রগণ্য এবং এ বিষয়ে তাঁর বিশিষ্টতা সর্বজনবিদিত। সমর-সংগীতের তালে তালে যোদ্ধাদের বীর্যবস্তুকে উৎসাহ দিয়ে আত্মোৎসর্গে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং এজন্য প্রয়োজন হয় উদ্দীপক-উত্তেজক কোরাস সংগীত। নজরুলের হাত ধরেই বাংলায় মার্চ সংগীতের ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ এবং সিদ্ধি। এ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাচন্দ্র বসুর একটি বিশিষ্ট মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের. গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই।.... নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান শুনিছি বলে মনে হয়না।"[৩৫] শুধু 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' নয়, তাঁর প্রায় সব মার্চ সংগীতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। বলা চলে 'চল্ চল্ চল্' শীর্ষক বিখ্যাত কোরাস সংগীতটি সম্পর্কেও। এই মার্চ সংগীতটি আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা যোগিয়েছে।

কোরাসটিতে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ যথার্থ। প্রাসঙ্গিক কিছু উধৃত করি :

উর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদি-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্ কাওয়াজ
খোল রে নিঁদ্‌মহল।
থাক্‌রে তখ্‌ত-তাউস

৩৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল ইসলাম*, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. প্রস্তাবনা, চৌদ্দ।

জাগ্‌রে জাগ বেহুঁস।
ডুবি লেরে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্ হীন বল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।
চল্ চল্ চল।[৩৬]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফার্সি শব্দ 'তখ্‌ত-তাউস'-এর সাথে কবি মিল বিন্যাস ঘটাচ্ছেন 'কত রোম গ্রীক্ রুশ'-এর মত দেশবাচক শব্দের অথচ কত সাবলীল-স্বচ্ছন্দ তার ব্যবহার। একই ব্যাপার ঘটে উদ্ধৃত চরণগুচ্ছের শেষ চার লাইনের মিল বিন্যাসে। 'জেগে ওঠ্ হীন বল'-এর 'ল' বর্ণের সংগে 'তাজমহল'-এর 'ল' বর্ণের ধ্বনিসাম্য কিছুতেই পাঠকের শ্রুতি বিবরকে পীড়িত করে না। 'হীন বল' বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ অথচ 'তাজমহল' ফার্সি ও আরবি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত।

একই কাব্যের (সান্ধ্য) 'ভোরের সানাই' কবিতার নিম্ন অংশটিতে আরবি-ফার্সি-বাংলা শব্দের সুষম ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

নামল কি ফের হাজার স্রোতে হেরোরা জ্যোতি জগৎ জুড়ে।।
আবার খালেদ তারিক মুসা আনল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আসল ছুটে হাসীন্ উষা নাও বেলালের শিরীন্ সুরে।।
তীর্থ পথিক দেশ বিদেশের আর্‌ফাতে আজ জুট্‌ল কি ফের,
'লা শারীক আল্লাহ্' মন্ত্রের নামল কি বান পাহাড় 'তুরে'।।
আঁজ্‌লা ভ'রে আনল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান।
আজকে রওশন জমিন-আস্‌মান নও জোয়ানীর সুর্‌খ্ নূরে।। [৩৭]

---

৩৬. ভোরের সানাই', (সন্ধ্যা), ঐ, পৃ. ৫৪৩
৩৭. 'রীফসর্দার', "সন্ধ্যা", ঐ, পৃ. ৫৪৯

বিশেষ করে 'হাসীন্ উষা', 'শিরীন সুর', 'লা শারীক আল্লাহ', 'বীর শহীদান', 'সুরখ্‌-নূর' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার কবি অভিপ্রেত চিত্রকল্প বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রূপে বিবেচ্য না হবার কারণ দেখিনা। "কাঠ মোল্লার মৌলবীর / যুজদানে ইসলাম কয়েদ, / আজও ইসলাম বেঁচে আছে / তোমাদেরি ঘরে, মোজাদ্দেদ"[৩৮] কথা গুচ্ছের 'যুজদান' ও 'মেজোদ্দেদ' শব্দদ্বয়ের প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করারও কারণ দেখিনা। একই কথা বলা যায়, 'বাংলার আজিজ' কবিতার "শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটেছে বাহার গুল, / গুলশানে গুল ফুটল যখন—নাই তুমি বুলবুল[৩৯]-এই পংক্তি দু'টিতে 'বাহার', 'গুল', 'গুলশন', 'বুলবুল' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের বেলায়।

নজরুলের হাতে আরবি-ফার্সি শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের বহু দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সম্ভবত কাব্য রসিক বোদ্ধা পাঠকেরা অস্বীকার করবে না যে নজরুল এ বিষয়ে যথেষ্ট মুনসিয়ানার পরিচয় দিতে পেরেছেন। পেরেছেন ভাবের পালে নতুন হাওয়া জোগাতে। বিশিষ্ট দু'জন ফার্সি কবির রুবাইয়াৎ অনুবাদ করতে গিয়েও নজরুল স্বীয় প্রতিভার স্বকীয়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। কবি দু'জন হচ্ছেন হাফিজ ও ওমর খৈয়াম। কাব্যদুটি হচ্ছে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।' রুবাইয়াৎ দুটির অনুবাদের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে বাংলা কাব্যে ইরানি আবহের সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভাব মাধুর্যের সম্মিলন। নজরুল যেহেতু আরবি ও ফার্সি – দুটি ভাষাতেই অনেকটা অভিজ্ঞ ছিলেন সেহেতু তাঁর পক্ষে মূল ব্যঞ্জনা ঠিক রেখে অনুবাদের কাব্য সৌকর্য ও মাধুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফার্সি কাব্যের মূল ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই অনুবাদে বহু আরবি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে নজরুলকে এবং তাতে তিনি যে অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করেছেন বর্তমান প্রসঙ্গে সেটাই স্মরণযোগ্য। প্রথমে রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ থেকে আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে দৃষ্টান্ত চয়ন করছি ঃ

(১) পরাণ ভরে পিয়ো শারাব,

---

৩৮. বাংলার আজিজ', (সন্ধ্যা), ঐ, পৃ. ৫৫১

৩৯. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, নং-১৭, *নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড*, বা/এ, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ / ২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ২৩।

জীবন যাহা চির কালের।
মৃত-জরা-ভরা জগৎ
ফিরে কেহ আসবে না ফের।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল
গেলাস সাথী মস্ত্ ইয়ার,
এক লহমার খুশির তুফান
এইত জীবন ! ভাবনা কিসের।[৪০]

(২) তোমার মুখের মিল আছে, ফুল
সাথে সে এক কমল-মুখীর।
যে ফুল হেরে দিল্ দেওয়ানা,
গন্ধ যথা সদাই খুশির।
সাধ জাগে এক ফুলদানীতে
রাখি তোরে আর তাহারে,
ফুলেল ঠোঁটে চুম্ব নিতে
লাগ্বে সুবাস পুষ্প-মদির।[৪১]

(৩) মদ্-লোভীরে মৌলভী কন,
পান করে এই শারাব যারা
যেমন মরে তেমনি করে
গোরের পারে উঠবে তারা।
তাইত আমি সর্বদা রই,
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,

---

৪০. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, নং-১৭, *নজরুল রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, বা/এ, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ / ২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ২৩।

৪১. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪

কবর থেকে উঠব – নিয়ে

এই শারাব—এই দিল্-পিয়ারা।[৪২]

প্রথম দৃষ্টান্তের 'শারাব', 'খুশি' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার যে শুধু স্বচ্ছন্দ তা নয়, বরং ইরানি আমেজ, আবহ ও ভাব প্রকাশেরও অনিবার্য অনুষঙ্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও ফুল্লমুখী মানসী প্রতিমার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া ফুলের সৌন্দর্যই যে শুধু উপমিত নয়, প্রেমবিহ্বল কবি পুরুষও সম্মোহিত। এবং সেই সম্মোহনের গভীরতা ও ব্যাপকতার কথা যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করা জরুরি প্রয়োজনেই 'দিল্ দেওয়ানা' শব্দের ব্যবহার। উল্লিখিত শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোন শব্দের দ্বারা উপমিত কবি বাঞ্ছনা লাভ করত এমন দাবী করবেন না সম্ভবত কোন কাব্যরসিক ব্যক্তিই। তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'শারাব', মদ-লোভীর অনন্ত 'শারাব' প্রত্যাশা বিষয়ে 'দিল পিয়ারা' শব্দের প্রয়োগ যথার্থতা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তুলবেন বলে মনে হয় না। রঙ্গিন 'শারাবের', সঙ্গে জীবন-মরণে মদ্যপায়ীর নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে যেমন উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে তেমনি রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের ৫৫ নং গানে তন্বী সাকির ঠোঁটামৃত লাভ করেছে 'আব-ই-হায়াত'- এর মর্যাদা।

পরান-পিয়া। কাটাই যদি

তোমার সাথে একটি সে রাত,

বসন সম জড়িয়ে রব

নিমেষ পলক করব না পাত।

ভয় কি আমার, যদিই সখি

তার পর দিন মৃত্যু আসে।

পান করেছি অমর-করা

তোমার ঠোঁটের "আব-ই-হায়াত"[৪৩]

বস্তুত 'আব-ই-হায়াত' শব্দের এমন যথাযথ প্রয়োগ আর হতে পারেনা। মূলত রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজেও নজরুলের আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের বৈদগ্ধ্য নিঃসন্দেহ মননশীল, যেমন মননশীল 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে'। রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম

---

৪২. ঐ, পৃ. ২৮

৪৩. ঐ, পৃ. ৩৫

থেকে এতদসম্পর্কিত কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক—

(১) আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শিরিন ঠোঁট,
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকি জেগে ওঠ !
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপি রং শারাব
মনে ব্যথার বিনুনি মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।[৪৪]

(২) আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙিন গুল্
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফুজুল।[৪৫]

(৩) সাকি ! আনো আমার হাতে মদ -পেয়ালা, ধরতে দাও !
প্রিয়ার মতন ও মদ মদির সুরত-ওয়ালী বরতে দাও !
জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা দেয় গাঁটছড়ায়,
সেই শারাবের শিকল, সাকি, আমায় খালি পরতে দাও।[৪৬]

(৪) স্বর্গে পাব শারাব সুধা, এ যে কড়ার খোদ খোদার,
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয় এ কোন্ বিচার ?
হামজা সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব—
তুচ্ছ কারণ – শারাব হারাম তাই হুকুমে মোস্তফার।[৪৭]

(৫) এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর,
প্রিয় সাকি, তাহার সাথে এক খানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব না কো তখত্ আমি শাহানশার।[৪৮]

(৬) মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ঐ গোলাপ গুল্
শরিয়তের আজ খেলাফ্ করে বেদম আমি করব ভুল।

---

৪৪. রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, রুবাই নং-৪, *নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড*, বা/এ, নতুন সংসবরণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ১০৭

৪৫. প্রাগুক্ত, রুবাই-নং-১৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

৪৬. প্রাগুক্ত, রুবাই-নং-১৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

৪৭. রুবাই-নং-৫৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৪৮. রুবাই-নং-৬১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

গুল্-লালা -রুখ কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে
উঠল রেঙে কানন ভূমি লালা ফুলের কেয়ারী-তুল।[৪৯]

(৭) তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শারাব রাত্রিদিন।
তোমার কাছে তসবি দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল্-পিয়ারা আর লাল পেয়ালি মদ-রঙিন।[৫০]

প্রথম দৃষ্টান্তের 'শিরিন' 'গজল', 'সাকি', দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'গুল', 'ফুজুল', ! তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'মদ-মদির সুরত-ওয়ালী', 'শারাব', 'সাকি' ; চতুর্থ দৃষ্টান্তের 'খোদা খোদার', 'শারাব হারাম', পঞ্চম দৃষ্টান্তের 'সোরাহি', 'সাকি', তখ্‌ত', 'শাহানশাহ', ; ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তের 'শরিয়ত', 'খেলাফ', 'গুল্-লালা-রুখ' এবং সপ্তম দৃষ্টান্তের 'তসবি', 'তাপস', 'দিল্-পিয়ারা' প্রভৃতি শব্দ নজরুলের হাতে যেন কথা কয়ে উঠেছে। তাঁর পূর্বসূরি কিম্বা উত্তরসূরি আর কোন কবি-সাহিত্যিকের হাতে আরবি-ফার্সি শব্দ এরকম ব্যঞ্জনায় ভাসিত হওয়ার মত সফল ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র ফররুখ আহমেদের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে। কিন্তু তিনিও নজরুলকে অতিক্রম করতে পেরেছেন, এমন দাবি সম্ভবত কেউ-ই করবেন না।

নজরুলের কাব্য বা গানে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'চন্দ্রবিন্দু'র (১৩৩৭) ৪৩ নং গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ কারণে যে, এ গানের শরীর নির্মাণে নজরুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। 'কাবা', 'রসুল', 'খোদা', 'আরশ', 'মজনু', 'লা-ইলা', 'দরবেশ', 'ইশক্', 'মসজিদ', 'আজান', 'মুয়াজ্জিন', 'কোরান', 'রুহ', 'রোজকিয়ামত', 'পুলসিরাত' প্রভৃতি মুসলিম পারিভাষিক আরবি-ফার্সি শব্দগুলোর প্রয়োগগত নৈপুণ্য উপলব্ধি করার জন্য গানটির প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করা জরুরি মনে করি :

বক্ষে আমার কা'বার ছবি,
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল
শিরোপরি মোর খোদার আরশ,

---

৪৯. রুবাই-নং-৭৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
৫০. রুবাই-নং-১১৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

গাই তারি গান পথ বেভুল।
লায়লির প্রেমে মজনু পাগল,
আমি পাগল 'লা-ইলার,
বোঝে আমায় প্রেমিক দরবেশ,
অরসিকে কয় বাতুল।।.......
আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান প্রেমের মুয়াজ্জিন,
প্রাণের 'পরে কোরান লেখা
রুহ্ পড়ে তা রাত্রিদিন।[৫১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত শব্দগুলোর ব্যবহার এতটা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল যে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। সঙ্গত কারণেই আমরা অন্যত্র দৃষ্টি ফেরাতে চাই। যেতে চাই 'জুলফিকার' (ভাদ্র ১৩৩৯)-এর গানে গানে নজরুলের আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের মুনসিয়ানা দেখতে। 'জুলফিকার'-এর ২৪টি গানের মধ্যে ২২টি গানই ইসলামি ঐতিহ্যমূলক। মুসলমানের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, তাদের তদানীন্তন শৌর্যবীর্য, সাফল্য, আত্মত্যাগ, আদর্শ, সত্যপ্রীতি স্মরণ করে বর্তমানে তাদের আদর্শচ্যুতি, পদস্খলন ও দূরপনেয় ব্যর্থতা অপনোদনের পথ-নির্দেশ প্রদান করেছেন কবি গান গুলোতে। জাগাতে চেয়েছেন পৌরুষ, অনুপ্রাণিত করেছেন জাতিগত ও ব্যক্তিগত অর্জনে। এই পর্যায়ের জুলফিকারের বিখ্যাত প্রথম গানটি হচ্ছে,

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।[৫২]

এই গানের ছত্রে ছত্রে আরবি-ফার্সি শব্দের সুদক্ষ ব্যবহার বিস্ময়কর। 'দীন-ই-

---

৫১. গান নং ৪৩, "চন্দ্রবিন্দু", *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বা/এ, নতুন সংস্করণ, ১৪০০, পৃ. ১১৯

৫২. গান নং ১, "জুলফিকার", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

ইসলামী', 'বেখবর', 'সূর্যতাজ', 'মুলুক', 'আসহাব', 'কাহাফ' প্রভৃতি শব্দ সমহিমায় দীপ্ত এবং বাংলা শব্দের সাথে রাখিবন্ধনে একীভূত। দ্বিতীয় গানটিতেও হারানো 'তখ্‌ত তাউস'[৫৩] স্মরণে চিত্রকল্প বিনির্মাণে কবি একই রকম কৃৎকৌশল দেখিয়েছেন। তৃতীয় গানেও 'খুশি লয়ে খোশরোজের', । 'খোশ নসীব' খেয়ালীদের শবে বরাতের দেয়ালি জ্বালাতে আহ্বান করে বলেছেন,

আন্ মহিমা হজরতের
শান্তি আন শেরে শেরে খোদার
কোরবানী আন্ কারবালার
আন্ রহম মা ফাতেমার।
আন্ উমরের শৌর্য বল,
সিদ্দিকের আন্ সাচ্চা মন,
হাসানের হোসেনের সে ত্যাগ,
শহীদের মৃত্যু–পণ।
খোদার হাবিব শেষ নবী
তুই হবি নবীর হাবিব।[৫৪]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য গানেও 'শেরে খোদা' 'কোরবানী' 'রহম্' 'শহীদ' হবিব' প্রভৃতি শব্দ অযৌক্তিক নয়। যেমন অযৌক্তিক নয় চতুর্থ গানের 'যাহার তক্‌বীর ধ্বনি / তকদীর বদলালো দুনিয়ার, নাফারমানির জামানায় /, আনিল ফরমান খোদার,/ পড়িয়া বিরান আজি, সে বুলবুলিস্তান –এর 'তকবীর' 'তকদীর', নাফরমানি', 'ফরমান', 'খোদার', প্রভৃতি শব্দ।

অনুরূপভাবে সপ্তম গানের "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে/ এল খুশির ঈদ।/ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে/ শোন আসমানী তাকিদ"[৫৫] এর 'রমজান', 'রোজা', 'খুশি', 'ঈদ' 'তাকিদ' ধ্বনি বিন্যাসে অসম, ভাব প্রকাশে দীন আনন্দোজ্জ্বল ঈদের চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ব্যর্থ – এমন কথা অরসিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বলবেন

---

৫৩. গান নং ২, "জুলফিকার", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০
৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১
৫৫. গান নং ৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

বলে মনে হয় না। বস্তুত 'বালাখানা', 'রাহে-লিল্লাহ', 'জাকাত', 'মুর্দা', 'ঈদগাহ', 'গাজী', শহীদ' 'বোস্তা', 'দুশমন'-এর মত ইসলামি ঐতিহ্যমূলক আরবি-ফার্সি শব্দ সহযোগে নির্মিত ঈদরূপ ইমারত যেন বাস্তবিক অর্থেই সুগঠিত, শিল্পসিদ্ধ।

'জুলফিকার'-এর ৮ নং গানটি উম্মুল কোরআন বলে অভিহিত সুরা আল ফাতেহা-র বঙ্গানুবাদ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে বাধ্যতামূলক ভাবে পঠিত সুরাটি অনুবাদ বিস্ময়কর ভাবে সফল। মূল কোরানিক আরবি ভাষার মধ্যে থেকে মাত্র একটি শব্দ 'মালিক', মূলগত ভাবে ব্যবহার করেছেন কবি! আর সব শব্দই বাংলা। অথচ তাৎপর্যগত ব্যঞ্জনা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি অনুবাদে। বরং মূলগত ভাবের পালে লেগেছে নতুন হাওয়া। একই রকম ব্যাপার ঘটছে ১২ নং গানের তাৎপর্যেও। নবী মোহম্মদ (সঃ)-এর আনিত শাফায়াত, জীবনাদর্শন ও মুক্তির বার্তা গ্রহণের জন্য কবির যে আহ্বান তা সত্যিকার অর্থেই মূলানুগ ও চমৎকার। এবং এই চমৎকারিত্বের মূলে কাজ করেছে 'সওদা', 'সওদাগর', 'বদনসীব', 'গুনাহগার', 'শাফায়াত্', 'আরশ', 'মোবারক', প্রভৃতি শব্দের সুবিন্যস্ত বিন্যাস। সচেতন পাঠকের অবগতির জন্য গানটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

ইসলামের এ সওদা লয়ে
এল নবীন সওদাগর।
বদনসীব আয়, আয় গুনাহ্গার,
নতুন করে সওদা কর।।[৫৬]

নজরুলের হাতে না'তে রসুলের সিদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত। ইসলামি গান ও গজলেও নজরুলের সমকক্ষ কবি-প্রতিভা দুর্নিরীক্ষ্য। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের উৎস মূল অনুসন্ধান করলে আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের কৃতিত্বই সর্বাগ্রে সনাক্ত হয়। আবার অধ্যাত্মমূলক গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা যে অশেষ সাফল্য, সেখানেও আরবি শব্দের সুপ্রযুক্তিই মূল চাবিকাঠি। একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক।

আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথাই বিরাজ করেন

৫৬. গান নং ৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

হেরে গুণীজন।।[৫৭]

কে অস্বীকার করবে উল্লিখিত দৃষ্টান্তের 'আহমদ' ও আহাদ' শব্দের কৃৎকৌশলী ব্যবহার? এবং কেইবা অভিভুত হবে না নজরুলের হাতে "খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে/ বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে"[৫৮] –র মত অভূতপূর্ব বাণী বিন্যাসে?

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন উষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে।।
কুল মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে কে এল, ঐ,
কালেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল, ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল, ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে – কে এল, ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেস্তা,
বেহেশতে সব দুয়ার খোলে।[৫৯]

এরূপ সর্বজনপ্রিয় গজল–গানের আরবি–ফার্সি শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা সুসমতা নিয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। মূলত এ বিষয়ে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য নজরুলেরই। তাঁর স্থান অনন্য এবং অবদান কালজয়ী।

'জুলফিকারে'র আলোচিত গানগুলো প্রসঙ্গে যা বলা হল, প্রায় নিঃসংশয়ে ভাবে তা বলা যাবে 'গুল–বাগিচা' (১৩৪০)–র ইসলামি গান গুলোতে ব্যবহৃত আরবি–ফার্সি শব্দ প্রসঙ্গে। অতএব বহুতর দৃষ্টান্ত চয়ন করার প্রয়োজন নেই। বরং দু' একটি নমুনাই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে—

(১) বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি' মুসলমান।
দাওত এসেছে নয়া জমানার

৫৭. গান নং ১২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
৫৮. গান নং ১৫, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯
৫৯. গান নং ১৬, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০

ভাঙা কিল্লায় উড়ে নিশান।।
মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী যোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্ আল্লাহর
চল্ আগে চল্ বাজে বিষান।

(২) খোদার হাবিব হলেন নাজেল
খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।
ঝুঁকে পড়ে আর্শ কুর্শী,
চাঁদ সুরুয তায় দেখতে আসে।।
ভেঙ্গে পড়ে মূরত মন্দির,
লাত মানাত, শয়তানী তখত্
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর
উঠছে তক্‌বীর আকাশে।।[৬০]

(৩) মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লেআলা
তুমি বাদশারও বাদশাহ্ কমলিওয়ালা।
পাপে তাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হ'ল পুণ্য বেহেশতী নূরে উজালা।[৬১]

এসব দৃষ্টান্তে সমহিমায় নজরুল ভাস্কর, যেমন ভাস্কর 'কাব্য আমপারা' এবং মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবন চরিত 'মরু ভাস্করে'।

'কাব্য আমপারা' (১৩৪০) কোরআন শরিফের ৩০তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। কোরআন শরিফের এই অংশটি মুসলিম জনমণ্ডলীর নিকট আমপারা নামে সমধিক পরিচিত, পঠিত এবং প্রাতহিক ধর্ম-কর্ম-নামাজে বহুল ব্যবহৃত। বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে নজরুল ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে মূল কোরানিক আরবি শব্দ অক্ষত রূপে

---

৬০. গান নং ৮৩, "গুল-বাগিচা", 'নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, বা/এ, নতুন সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ৩২৯।

৬১. গান নং ৮৪, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯

ব্যবহার করেছেন এবং শব্দটির যথার্থ অর্থ বাংলায় আভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 'কাব্য আমপারা'য় আরবি শব্দ ব্যবহারের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য নজরুলের। একমাত্র শব্দ সচেতন, মৌলিক প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই এমনটি সম্ভব। কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করে শব্দগুলোর ব্যবহার সাফল্য উদ্ধার করা যাক—

(১) কুমন্ত্রণাদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হতে চাহি পরিত্রাণ।[৬২]
(২) 'নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে 'হোতাময়"
"হোতামা" কাহারে বলে, জান কি তাহায়?
(ইহা) আল্লাহর সেই লেলিহান শিখা,
হৃদৎপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)।[৬৩]
(৩) পাল্লা হবে হাল্কা যার
(হবে) "হাভিয়া" দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি, তুমি জান কি সে?
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সে।[৬৪]
(৪) শপথ "তারেক" ও আকাশের
সে "তারেক" কি তা জান কি সে?
নক্ষত্র জ্যোতিষ্মান
(নিশীতে আগত অতিথি সে)।[৬৫]

উল্লেখিত দৃষ্টান্ত চতুষ্টয়ের 'খান্নাস' 'হাতামা' 'হাভিয়া' 'তারেক' প্রভৃতি আরবি শব্দ নজরুলের হাতে ব্যবহার গুণে বাঙালি পাঠকের কাছে বাংলা শব্দের মত সহজবোধ্য বলে প্রতীয়মান হয় নাকি?

---

৬২. গান নং ৮৬, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০

৬৩. সুরা নাস, কাব্য আমপারা, *নজরুল রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, নতুন সংস্করণ , ১১ জ্যৈষ্ঠ-১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃ. ৩৩৯

৬৪. সুরা হুমাজাত, কাব্য আমপারা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

৬৫. সুরা ক্কারেয়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪

অনুরূপভাবে 'মরুভাস্কর (১৩৫৭)-এ ইসলামি জীবন ভাষ্যের রূপকার হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শিক জীবনালখ্যে নির্মাণের ক্ষেত্রে আরবি-ফার্সি শব্দের গুরুত্ব যে বিকল্পহীন, তা উপলব্ধি করা যায় হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মলগ্নের চিত্র অংকন উদ্দেশ্যে নজরুলের নিম্ন বর্ণনায়—

জেগে উঠ তুইরে ভোরের পাখি,
নিশি প্রভাতের কবি।
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব রবি।
ওরে ওঠ তুই, নতুন করিয়া
বেঁধে তোল তোর বীণ্।
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজান মুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি
খায়রুম্ মিনান্নৌম।[৬৬]

লক্ষণীয় যে 'আজান', 'মুয়াজ্জিন', 'সালাত', 'খায়রুম মিনান্নৌম', প্রভৃতি আরবি শব্দ উপযুক্ত চিত্রকল্প নির্মাণে সুপ্রযুক্ত এবং ইসলামি আবহের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অএতব নজরুলের আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার আর কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয়না। তবে সব বিষয়ে সব ক্ষেত্রে যে নজরুলের হাতে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ ষোল আনাই সফল, এমন কথা ভাবার কারণ নেই। বরং অভিনিবেশ সহকারে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর হাতে আজাচারী শব্দ প্রয়োগের নমুনা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কাব্য-কবিতার বিভিন্ন পর্যায়ের, বিশেষ করে তাঁর ইস্লামি গান, গজল, হামদ, নাত, 'রুবাইয়াৎ-ই-

---

৬৬. সুরা তারেক, *প্রাগুক্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

হাফিজ', রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈইয়াম' প্রভৃতি থেকে চয়িত দৃষ্টান্তগুলো নিরাবেগ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ, বিচার বিশ্লেষণ ও মুল্যায়ন করলে নজরুলের জন্য সম্মানজনক অনন্য একটি আসনই সংরক্ষিত থাকবে। স্বীকার করতে হবে তাঁর প্রতিভার এতদবিষয়ক শাণিত, ধারালো, রসজ্ঞ বৈশিষ্ট্য। সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুলের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদ সাফলের্য কথা বলতে গিয়ে যেমন বলেছেন, "কাজীর অনুবাদ সফল অনুবাদের কাজী", তেমনি বলা যায় আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নজরুলের আসন 'কাজীরই'। অন্তত এ বিষয়ে এযাবত কালের শব্দরসিক সাহিত্য সারথীদের চেয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে তুলনারহিত।